মার্কস ছিলেন মানবমুক্তির সংগ্রামের পথপ্রদর্শক

মনীষী কার্ল মার্কসের দুইশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ মে বিএমএ মিলনায়তনে
সিপিবি-বাসদ এর আলোচনা সভায় খালেকুজ্জামান

৫ মে ছিলো মনীষী কার্ল মার্কসের দুইশততম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ'এর উদ্যোগে ৫ মে তোপখানা রোডের বিএমএ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, সিপিবির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কমরেড মনজুরুল আহসান খান, সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড মো. শাহ আলম, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক ও বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। সভা পরিচালনা করেন বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। আলোচনা সভার শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী এবং চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিল্পীরা। কার্ল মার্কসের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন সিপিবি'র কেন্দ্রীয় নেতা মো. কিবরিয়া।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ লন্ডনের হাইগেট মার্কসের সমাধিপাশে এঙ্গেলস তাঁর বক্তৃতায় মার্কস সম্পর্কে বলেছিলেন, '১৪ মার্চ বেলা পৌনে তিনটায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন' কিন্তু সেই চিন্তার প্রবাহ আজও থামেনি। যে কারণে তাঁর জন্মের দুই শ বছর পরও দুনিয়াব্যাপী তাঁকে নিয়ে আলোচনা চলছে। তাঁর চিন্তার তাৎপর্য-গভীরতা-বিস্তার বিশাল এবং ব্যাপক, স্বল্পপরিসরে তা তুলে ধরা কঠিন। তিনি বলছেন-এখনও মানুষের প্রকৃত ইতিহাস শুরুই হয়নি। একটা ছিল শ্রেণিহীন আদিমগোষ্ঠী, তারপর থেকে শ্রেণি বিভক্ত সমাজ রচিত হয়, চলছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। প্রকৃত মানুষের ইতিহাস শুরু হবে সেদিন, যেদিন মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থাকবে না। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না, শ্রেণি থাকবে না ও রাষ্ট্র থাকবে না। সেদিনই সত্যিকার অর্থে মানুষের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হবে। যত দিন পর্যন্ত মানুষ পূর্ণ মানুষের স্তরে উন্নীত না হবে এবং যত দিন এই শ্রেণি বৈষম্য, শোষণ, থাকবে তত দিন কার্ল মার্কস বারে বারে আসবেন-তার চিন্তার প্রবাহ থাকবে, নতুন নতুন সংযোজন থাকবে।

আমরা কেন মার্কসকে স্মরণ করি, তার অনেকগুলো দিক আছে। কেমন মানসিকতা, মনন, চিন্তাভাবনা, চরিত্র হলে পরে মার্কসকে বুঝা যায় এবং তাঁর অনুসারী হওয়া যায় তার একটা ঘটনা তুলে ধরা যায়। মার্কস যে স্কুলে পড়তেন 'ফ্রেডরিখ উইলহেলম জিমনাশিয়ামে'-এ। সেখানে সমাপনী পরীক্ষায় সবাইকে একটা রচনা লিখে জমা দিতে হতো। কার্ল মার্কসকে যে বিষয়ে লিখতে বলা হয়েছিলো তা হলো-পেশা নির্বাচনে একজন তরুণের মনোভাবনা (Reflections of a Young Man on the Choice of a Profession)। ১৮৩৫ সালের আগস্ট মাসে লেখা সে রচনায় তিনি লিখেছিলেন—'যে পেশা একজনকে মানবজাতির সেবা করার জন্য সর্বোত্তম সুযোগ করে দেবে, পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হওয়া উচিত।' যদিও এটা যে সহজ কাজ নয় তা উল্লেখ করে সেই রচনায় লিখেছিলেন—'আমরা এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থায় আসার আগেই সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিরূপিত হওয়া কিছুটা হলেও শুরু হয়ে যায়' (our relations in society have to some extent already begun to be established before we are in a position to determine them)। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কের যে গুরুত্বের কথা আমরা মার্কসবাদে পাই, তারই অনুরণনের আভাস যেন এখানে সুপ্ত রয়েছে। এরপর প্রবন্ধের সারকথা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন-'কেউ যদি শুধুমাত্র নিজের জন্য কাজ করেন, তবে তিনি হয়তো একজন পড়াশোনা করা বিখ্যাত ব্যক্তি, একজন মহান ঋষি, এক অসাধারণ কবি হয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনোই যথার্থ অর্থে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবেন

না।...একজন মানুষ যদি নিজের জীবনের জন্য এমন একটি অবস্থান নির্ণয় করেন যার কারণে তাঁর অধিকাংশ কাজ হবে মানবজাতির কল্যাণের জন্য তবে তিনি আনন্দ লাভ করবেন, তবে তা কোন হীন, ক্ষুদ্র, আত্মসর্বস্ব আনন্দ নয়, বরং তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে বিরাজ করে সুখ লাভ করবেন।' এই ছিলো ১৭ বছরের স্কুল পড়ুয়া কিশোর মার্কসের মানসিক অবস্থা। সমাজ সচেতনতা থেকে এর পর তিনি লিখছেন, 'আমরা কী হব তা নিয়ে আমাদের একটা বিশ্বাস থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস থাকলেই যে হতে পারব এমন কোনো কথা নেই। সমাজে আমাদের সম্পর্ক আমরা নিজেরা নির্ধারণ করবার আগে থেকেই সেই সম্পর্ক কিছুটা পরিমাণে শুরু হয়ে গিয়েছে।' তাই বলা যায়, একজন মানুষ যে আর্থসামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বেড়ে ওঠে, তার স্বপ্ন, চিন্তা পরিণত রূপ পাওয়া ওই সমাজের সাথে সম্পর্কিত-এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

আমরা যদি দেখি ওই বয়সের তরুণরা আমাদের দেশে আজকে কী চিন্তা করে? তাদের চিন্তায় আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদীতা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। জ্ঞান অর্জনের চেয়েও জিপিএ-৫, অনেক মূল্যবান। কীভাবে সমাজকে ডিঙ্গিয়ে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা পাবে এগুলো। আমরা মার্কসকে নিয়ে আলোচনা করছি যাতে আমাদের তরুণরা উন্নত মনুষ্যত্ব অর্জনের ভাবনা ভাবতে শিখে। আজকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষ, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, যা মানুষের মাধ্যে বাড়িয়ে দিচ্ছে পাশবিক উন্মত্ততা। কার্ল মার্কসের জীবনবোধ ও জীবন সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপ আমরা যদি সমাজে সঞ্চারিত করতে না পারি, কৃষকদের মধ্যে, শ্রমিকের মধ্যে, বুদ্ধিজীবী-পেশাজীবীসহ তরুণদের মধ্যে নিতে না পারি, তা হলে মানবমুক্তির আন্দোলন, শোষণমুক্তির আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠবে না। বুর্জোয়ারা সুচতুরভাবে ভোগবাদী পণ্যমানসিকতা গড়ে তুলছে, প্রচার করছে যা মানুষের অজান্তেই পুঁজিবাদী সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং শোষণমুক্তির লড়াইয়ের বিপরীত শক্তিরূপে দাঁড়িয়ে যায়। তাই মার্কসের জীবন-চরিত্র ও ভাবনাটা যদি আমরা যুবসমাজের কাছে নিয়ে যেতে না পারি তা হলে শোষণমুক্তির সংগ্রাম বেগবান হবে না।

অনুসন্ধিৎসু মন সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখি, মার্কস এক সময়ে হেগেলের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। হেগেলের বই *এসেন্স অব খ্রিশ্চিয়ানিটি*, *লেকচারস অন দ্যা ফিলসফি অব রিলিজিয়ন*, *লেকচার অন দ্যা ফিলসফি অব হিস্ট্রি* এই বইগুলো যখন তিনি পড়ছেন তাতে আকৃষ্ট হয়েছেন। আবার এর মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা, তাও তিনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। সেই সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে সমসাময়িক বন্ধু মহলে তর্কবিতর্ক চলতো। ওই সময় হেগেলীয় চিন্তায় যারা প্রভাবিত ছিলেন, তারা ছিলেন দুই ভাগে বিভক্ত। এক দল রক্ষণশীল আরেক দল প্রগতিবাদী। মার্কস ছিলেন প্রগতিবাদী, সে দলে লুডভিগ ফয়েরবাখ, ব্রুনো বয়ার, আরনল্ড রুজও ছিলেন। পরবর্তীতে মার্কস সে চিন্তার প্রভাব থেকে বের হয়ে ফয়েরবাখের চিন্তায় আকৃষ্ট হয়। এখানেও তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু মনের মানুষ। তিনি ফয়েরবাখের চিন্তায়ও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। যুক্তির কষ্টিপাথরে টেকেনি বলে সেখান থেকেও তিনি সরে আসেন। ওই সময় মার্কস তাঁর জ্ঞান, বলিষ্ঠ যুক্তি, বিশ্লেষণের গভীরতা ও যুক্তির কাঠামোর সমাঞ্জস্যতার জন্য সকলের কাছে মুগ্ধতার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। একজন অত্যন্ত খ্যাতিমান ইয়ং হেগেলিয়ান মোজেস হেস তাঁর বন্ধুকে ১৮৪১ সালে লিখছেন-'সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্ভবত একমাত্র জীবিত এবং সত্যিকার অর্থে দার্শনিকের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকো। ড. মার্কস আমার আদর্শ-যিনি এখনও অত্যন্ত তরুণ (বোধকরি বয়স ২৪-এর বেশি হবে না)-মধ্যযুগীয় ধর্ম ও রাজনীতিকে শেষ মরণ আঘাত হানবেন; তিনি শানিত ব্যঙ্গের সংমিশ্রনে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রখর দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করেন; যদি তুমি কল্পনা করতে পারো রুশো, ভলতেয়ার, হোলবাখ, লেসিং, হাইনে এবং হেগেলের সমন্বয়ে একক কোন ব্যক্তিত্বকে-আমি যান্ত্রিকভাবে সমন্বয়ের কথা বলছি না-একমাত্র তাহলেই ড. মার্কস সম্পর্কে একটা ধারণা তুমি পাবে।'

মার্কসের বিজ্ঞান মনস্কতার একটা কথা উল্লেখ করা যায়-১৮০৮ সালে ডালটনের 'পরমাণু'-র অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থিত করার পর থেকে ১৮৯৭ সালে থমসনের ইলেকট্রন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন, 'পরমাণু' অবিভাজ্য। দর্শনের জগতেও পরমাণুকে কেন্দ্র করে বস্তুর স্বরূপ নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল। সেই সময় এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের পত্রাবলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মার্কস উল্লেখ করেছেন, বস্তুর অভিভাজ্য চূড়ান্ত রূপ হিসেবে একটি পরমাণুকে বিবেচনা করা উচিত নয়। পরবর্তীতে মার্কসের ডক্টরেট থিসিস সম্পর্কে জাপানের বিখ্যাত কণা-পদার্থবিদ শৈচি সাকাতার একটি উক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, 'এই হিসাবে, মার্কসের ডক্টরেট থিসিসকে আজকের বিজ্ঞানের অন্তঃস্থ চিন্তার একটি উৎস হিসেবে দেখা যেতে পারে, যে উৎস থেকে 'পুঁজি' রচিত হয়েছে এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা গড়ে উঠেছে।' মার্কস বিজ্ঞানের যেকোন আবিষ্কারের প্রতি ছিলেন গভীর মনোযোগী। নতুন যে কোনো সমাজতত্ত্ব, দার্শনিক মতবাদ সামনে আসুক না কেন তিনি তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঢুকার এবং বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করতেন।

এঙ্গেলস বলেছেন, মার্কস-এর মতবাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ৩টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গুরুপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে-বিজ্ঞানী মেয়ার এবং জুল এর আবিষ্কৃত বস্তুর অবনাশী তত্ত্ব, বিজ্ঞানী লিউন হুকের কোষ তত্ত্ব, বিজ্ঞানী ডারউইনের প্রজাতির উদ্ভব ও বিবর্তন তত্ত্ব। বলাচলে ইউরোপীয় প্রকৃতি বিজ্ঞান। লেনিনের রচনায় মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে বলা আছে-জার্মানির চিরায়ত দর্শনশাস্ত্র, ব্রিটিশ

রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র এবং এবং ফরাসি সমাজতন্ত্র। এর সাথে আমরা বলতে পারি ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন, বিশেষ করে ১৮৩৮ সালে ইংল্যান্ডের প্রগতিশীল চার্টিস্ট মুভমেন্ট, ফ্রান্সের কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদিও একটা সামাজিক চাহিদা তৈরি করেছিল বিপ্লবী তাত্ত্বিক কাঠামো রচনায়। অর্থাৎ, প্রাক-মার্কসীয় কালের চিন্তাশীল ও অগ্রগামী ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলো মার্কস গ্রহণ করেছিলেন, আন্দোলনগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মনিষীদের মনোজগতে ইতিমধ্যে যেসব জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিলো যথার্থভাবে সেসবের উত্তর দেওয়ার মধ্যেই আছে মার্কসের প্রতিভার নিদর্শন।

একটা গুরুপূর্ণ বিষয় হলো সৃষ্টিশীল জ্ঞান অর্জন কখনো প্রগতিবাদী সংগ্রাম বাদ দিয়ে হয় না। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ তত্ত্ব চর্চা করে যেমন জ্ঞান অর্জন হয় না, তেমনি পরিপূরক তত্ত্ব ছাড়া সংগ্রামও দানা বাঁধে না। বস্তুজগত যেহেতু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আর বস্তুজগত সম্পর্কিত জ্ঞানও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যেমন : পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এগুলোর হলো বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ সত্য। এ বিশেষ নিয়মগুলো বিচ্ছিন্ন নয়, তার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। এটার নামই হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, এই সাধারণ যোগসূত্রের নিয়ম মার্কস আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বস্তুর মধ্যে যেমন গতি আছে, সমাজের মধ্যেও গতি আছে। উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের কারণে সমাজ গতিশীল হয়। কীভাবে তা হয়? মার্কস দেখালেন, সমাজ বিকাশের ইতিহাস হলো 'উৎপাদন' বা 'উৎপাদন পদ্ধতি' বিকাশের ইতিহাস। উৎপাদন পদ্ধতির একটি দিক হলো উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদনের জন্য যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় এবং তার সাথে যে মানুষ তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়, এই দুইয়ের সমন্বয় গড়ে ওঠে উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ শুধু প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে না, একজন আর একজনের সাথেও ক্রিয়া করে। উৎপাদন করার জন্য মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং শুধুমাত্র এই সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের ভেতর থেকেই প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করলে উৎপাদন সংঘটিত হয়। উৎপাদন বা উৎপাদন পদ্ধতির অন্য আর একটি দিক হলো-উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে বিকশিত হয়। যদিও উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক একে অপরের সাথে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে যুক্ত থাকে, একে অপরকে প্রভাবিত করে। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়। তার সাথে সমাজব্যবস্থারও পরিবর্তন আসে।

মার্কসের যে মানসিকতা, অনুসন্ধিৎসু মনন, চিন্তাভাবনা, চরিত্র-সেটা যুব সমাজের কাছে আড়াল করতে চাইছে। আমাদের দেশের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী চরম অবক্ষয়ের যুগে আমাদের দেশেও আমরা দেখি দেশে ৮০ লাখ মাদকাসক্ত, ভোগবাদী সংস্কৃতি, নীতি আদর্শহীনতার দিকে মানুষ ধাবিত হচ্ছে। সমাজে এগুলো তারা যত বাড়াতে পারবে-তা পুঁজিবাদের টিকে থাকার জন্য ততো সহায়ক হবে। বিপ্লবী রাজনীতির জন্য হবে সম-ক্ষতিকর। তাই এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

রাষ্ট্র এখন যেভাবে চলছে তা যদি আমরা চলতে দেই তা হলে বিপ্লবী শক্তি ক্ষয় হবে। তাই আমাদের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি, বিকল্প তত্ত্ব, বিকল্প সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, চর্চা বাড়াতে হবে। অনেকে বলে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ। মার্কস নিজেই সমাজতন্ত্র চোখে দেখেননি কিন্তু চিন্তার শক্তিতে সাম্যবাদ পর্যন্ত দেখেছেন। এটা হলো শ্রেণিবিভক্ত থেকে শ্রেণিহীন সমাজের যাওয়ার সামাজিক নিয়ম। বিজ্ঞানের গবেষণাগারের মতো সমাজেও এর নানা ধরণের ফল আসবে, উত্থানপতন, চড়াই-উতরাই হবেই। আমাদের আরও বুঝতে হবে, সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ শ্রেণিহীন সমাজ নয়, সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীন সমাজ নয়। ফলে, দুএকটা দেশের সমাজতন্ত্রের সফলতা-ব্যর্থতা দিয়ে সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় না। তবে, এই প্রক্রিয়াতেই সমাজ এগুবে। বুর্জোয়া রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী প্রচারকরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এরা মানুষের বিভ্রান্তিকে বাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে অবৈজ্ঞানিক কিছু তত্ত্ব এনে হাজির করে, চমক লাগায়, এগুলো মেকি। তাই আমাদের সব ধরনের লড়াই জারি রাখতে হবে, শক্তি বাড়াতে হবে, সমর্থন বাড়াতে হবে। রাজনীতির মাঠে মানুষ এক বুর্জোয়ার বাইরে আরেক বুর্জোয়াকে দেখে-আমাদের দেখাতে হবে বুর্জোয়ার সাথে লড়াই চলবে বামপন্থার। নীতিহীনতার বিরুদ্ধে আদর্শবাদের, আমাদের সেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, শ্রমিক শ্রেণির লড়াইকে অগ্রসর করার মধ্য দিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল মানুষের মুক্তির যে দিশা দেখিয়েছেন কার্ল মার্কস, আজও তা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষকে লড়াইয়ের দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। মার্কস মেহনতি মানুষের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রমিকশ্রেণির হাতে তাদের মতাদর্শিক হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ, বিপ্লবী তত্ত্ব নির্মাণ, দর্শনকে মানুষের জন্য কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে মার্কস দুনিয়ার একজন একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তক ও দার্শনিক হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত হয়েছেন। তাই কার্ল মার্কস তার জন্মের দুইশ বছর পরে আজও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। পুঁজিবাদ আজ যখন মুক্তবাজার অর্থনীতি, উদারনীতিবাদ, বিশ্বায়নের নামে নতুন নতুন চেহারায় তাদের শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, সেসময় কার্ল মার্কস আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। কার্ল মার্কসের বিপ্লবী জীবন ও তার দেখানো পথ

থেকে শিক্ষা নিয়ে শোষণহীন মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে অগ্রসর করার মধ্য দিয়ে কার্ল মার্কসের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা সম্ভব হবে।

আলোচনা সভায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বলেন, কার্ল মার্কসের শিক্ষা থেকেই বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। বক্তারা আরও বলেন, পৃথিবী থেকে একদিন পুঁজিবাদ বিলুপ্তি হয়ে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবেই। বর্তমান বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা বদলাতে গেলে ও পুঁজিবাদকে বুঝতে হলে মার্কসকে পড়তে হবে। বিশ্বপুঁজিবাদকে পরাজিত করতে আজ দুনিয়ার সকল মানুষকে এক হতে হবে। আলোচনা সভা শেষে, রণেশ দাশগুপ্ত চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে 'মুক্তি মশাল' শীর্ষক একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়।